আত-তাহাকুম ইলাত-ত্বগুত

[ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়া]

শায়খ আবু আলী আল-আনবারী
শায়খ আলী আল-খুদাইর
শায়খ নাসির আল-ফাহাদ
শায়খ আবু বা'রা আস-সাইফ





আত-তাহাকুম ইলাত-ত্বগুত

[ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়া]

শায়খ আবু আলী আল-আনবারী
শায়খ আলী আল-খুদাইর
শায়খ নাসির আল-ফাহাদ
শায়খ আবু বা’রা আস-সাইফ

১৪৪৭ হিজরি
অনুবাদ ও প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications

بسم الله الرحمن الرحيم

বিষয়বস্তু

১. দরুরহ (প্রয়োজনীয়তার) এর জন্য ত্বগুতের কাছে তাহাকুম (বিচার চাওয়া/প্রার্থনা) করা (নিজের অধিকার রক্ষার জন্য হলেও) শিরক।

২. ইকরাহ (জোরপূর্বক/বাধ্য করা/বলপ্রয়োগ করা) ব্যাতিত দরুরতে (প্রয়োজনে) ত্বগুতের নিকট তাহাকুম (বিচার চাওয়া) হারাম। এবং মাসলাহা'র (কল্যাণ) জন্যও ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়া শিরক।

৩. শরীয়াহ আদালতের অনুপস্থিতির কারণে ত্বগুতের আদালত থেকে বিচার/রায়/ফায়সালা চাওয়া শিরক।

৪. ত্বগুতদের কাছ থেকে তাহাকুম (বিচার ফয়সালা চাওয়া) জায়েজ নয়, যদিও তাদের বিধান শরীয়তের বিধানের অনুরূপ হয়।

৫. ইকরাহ মুলজী/ইকরাহ'র ওজর বৈধ হওয়ার শর্তসহূহ।

৬. ত্বগুতকে বিচারক না মেনে বিচার চাওয়াও জায়িয নয়।

৭. নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য/নিজেকে রক্ষা করার জন্য ত্বগুতের আদালতে গিয়ে সত্য/যুক্তি/প্রমাণ উপস্থাপন করা কুফর নয়।

৮. ত্বগুতের হাতে বন্দি মুসলিমকে রক্ষার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা।

সূচনা

নিকৃষ্ট ত্বওয়াগীত – যাদেরকে অস্বীকার করা, পরিত্যাগ করা ঈমান আনয়নের প্রথম শর্ত। ত্বগুতের কাছে তাহাকুম করা (বিচার চাওয়া) শিরক, তথাপিও মানুষ ত্বগুতের কাছে বিচার/ফায়সালা চাওয়া মাধ্যমে মুশরিক হয়ে যাচ্ছে, যেমনটি মহান আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এবং নির্লজ্জতা অথবা অজ্ঞতার চরম সীমায় পৌঁছে বিভিন্ন অগ্রহণযোগ্য ওজর দিচ্ছে এমনকি মাসলাহা'র কথা বলে শিরককে বৈধ করছে।

আবার অন্যদিকে তাহাকুমের যথাযথ মাস'আলা না জানার কারণেও অনেক ফিতনা ফাসাদ দেখা দিচ্ছে, এতে অনিয়ন্ত্রিত তাকফিরের ফিতনা দেখা দিয়েছে। তাই, এই দুপক্ষের ভ্রান্তি নিরসনে এবং আল্লাহ সুবহানু ওয়াতাআ'লার আয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই কিতাবটি আনা হলো।

১. দরুরহ (প্রয়োজনীয়তার) এর জন্য ত্বগুতের কাছে তাহাকুম (বিচার চাওয়া/প্রার্থনা) করা (নিজের অধিকার রক্ষার জন্য হলেও) শিরক।

শায়খ আবু বা'রা আস-সাইফ حفظه الله

ত্বগুতের নিকট থেকে বিচার চাওয়া:

ত্বগুত সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত মানুষের মাঝে বিচার করে — যেমন গণতান্ত্রিক আইন বা গোত্র ও বংশীয় প্রচলিত রীতিনীতির মাধ্যমে, যা শরীয়তের বিরোধী। এ ধরনের কার্যে লিপ্ত হওয়া কুফর (অর্থাৎ ইসলামের বিরোধিতা ও অস্বীকার) হয়ে যায় নিম্নোক্ত শর্তে:

(ক) যখন কেউ তার (ত্বগুতের) রায় চায় দুনিয়াবি বা দ্বীনী কোনো বিষয়ে এই উদ্দেশ্যে যে, সে রায় মেনে চলবে এবং তার অনুসরণ করবে — যেমন হালাল ও হারাম সংক্রান্ত রায় এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিধান, যা কেবলমাত্র আল্লাহ ﷻ একাই বিধান দেওয়ার অধিকার রাখেন।

(খ) যখন কেউ কোনো দুনিয়াবি বা দ্বীনী বিষয় সংক্রান্ত ঝগড়া-বিবাদ বা মতবিরোধে তার রায় ও বিচার চায় — এই উদ্দেশ্যে যে, সে বিচার অনুযায়ী কাজ করবে ও তা মান্য করবে।

যদি কেউ এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ত্বগুতের নিকট থেকে বিচার চায়, তাহলে এটি তাহাকুম (ত্বগুতের নিকট বিচার চাওয়া) বলে বিবেচিত হবে, যা কুফর; এবং তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যাতে সে ত্বগুতে ঈমান আনে, তার ইবাদত করে এবং আল্লাহর ﷻপ্রতি কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়।

আল্লাহﷻ বলেন:

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থায় উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা ত্বগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়?[সূরা আন্-নিসা: ৫৯–৬০]

আজকের যুগে ত্বগুতের নিকট থেকে যেসব তাহাকুম (বিচার প্রার্থনা) করা হয়, যা কুফরের পর্যায়ে পড়ে — যদি একজন প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তা ইচ্ছাকৃতভাবে ও সচেতনভাবে করে — তা হলো: ত্বগুত বিচারকের নিকট সরাসরি কোনো মামলা বা বিষয় উত্থাপন করা, কিংবা একজন আইনজীবী নিয়োগ করে তার মাধ্যমে মামলা উত্থাপন করা এবং তাকে নিজের প্রতিনিধি বা ওকালতদার বানানো।

শায়খ আলী আল-খুদাইর فك الله أسره

এটি(ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়া) আল্লাহ ﷻও তাঁর রাসূল ﷺছাড়া অন্য কারও থেকে বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে শিরক, কারণ এতে বিরোধে জড়িত দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ ও তার নিষ্পত্তি রয়েছে। আর আনুগত্যের শিরক হলো— এমন কাউকে অনুসরণ করা যার আদেশ ও নিষেধ দেওয়ার ক্ষমতা আছে এমন সাধারণ বিষয়ে যা স্পষ্টভাবে শরীআতের বিরোধী।

এই বিষয়ে আমাদের করণীয় কী? আমাদের করণীয় হলো— এটি পরিত্যাগ করা, এতে কুফরি/অস্বীকার করা, এটিকে ঘৃণা করা এবং যে ব্যক্তি এর দ্বারা বিচার করে তাকে তাকফির করা, ইত্যাদি। আল্লাহﷻ বলেন:

“যখন ইব্রাহিম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, আমি তোমাদের উপাস্যদের থেকে মুক্ত, তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে সৎপথে চালাবেন।”[সূরা যুখরুফ ২৬–২৭]

আর তিনি বলেন:

“তারা যখন তাদের কওমকে বলল, আমরা তোমাদের ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যা উপাসনা কর তা থেকে মুক্ত, আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করছি, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহেত ঈমান আনো।“[সূরা মুমতাহিনা ৪]

আপনি এর দ্বারা বিচার চাইতে পারবেন না, কারণ তা হল ত্বগুতের দ্বারা বিচার চাওয়া। তিনি বলেন:

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা ত্বগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।“[সূরা নিসা ৬০]

২. ইকরাহ (জোরপূর্বক/বাধ্য করা/বলপ্রয়োগ করা) ব্যাতিত দরুরতে (প্রয়োজনে) ত্বগুতের নিকট তাহাকুম (বিচার চাওয়া) শিরক। এবং মাসলাহা'র (কল্যাণ) জন্যও ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়া শিরক।

শায়খ আবু বা'রা আস-সাইফ:

দরুরহ (প্রয়োজনীয়তা) ও ইকরাহ (জোর-জবরদস্তি/বাধ্য করা)-এর মধ্যে পার্থক্য:

দরুরাহ হলো এমন বিষয় বা অবস্থা, যেখানে কিছু হারাম কাজ অনুমোদিত হয়, যেগুলো কুফরের স্তরে পৌঁছেনি। যেমন: মৃত পশুর মাংস খাওয়া, যদি সে অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা করে এবং মৃত পশুর মাংস ছাড়া কিছুই না পায়। আবার কেউ যদি গলায় খাবার আটকে যাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে এবং শুধু মদই থাকে খাবার নামানোর জন্য।

এই দরুরহ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

“তিনিই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জীবজন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে কেউ যদি নিরুপায়/মজবুর/বাধ্য হয়[প্রয়োজনে] — ইচ্ছাকৃতভাবে না[বা কামনা করে না], সীমা অতিক্রম না করে — তবে তার উপর কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।”[সূরা আল-বাকারা: ১৭৩]

আর ইকরাহ হলো এমন বাধ্যবাধকতা, যেখানে কোনো ব্যক্তি কুফরী কাজ করতে পারে যদি তাকে জোরপূর্বক বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের ওপর স্থির/দৃঢ় থাকে।[ঈমানের উপর অন্তর দৃঢ় থাক শর্ত]

আল্লাহ ﷻবলেন:

“কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করলে এবং কুফরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার অন্তর ঈমানে অবিচলিত।“[সূরা আন-নাহল: ১০৬]

আল্লাহ ﷻকখনোই কোনো মুকাল্লিফ (সুস্থ-সজ্ঞান/যার উপর শরীয়তের বিধান কার্যকর হয়) ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে কুফর বা শিরকে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি

দেননি, শুধু সেই ব্যক্তির জন্য ব্যতিক্রম যে ইকরাহ মুলজি(জোর-জবরদস্তি/বাধ্য করা/বলপ্রয়োগ করা) অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে সে মুক্তি পেতে অক্ষম। আর অন্য কোনো শ্রেণি এই ক্ষেত্রে (ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়াতে) অনুমোদিত নয়।

সুতরাং, দ্বীনের কোনো প্রয়োজনীয়তা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কুফর বা শিরকের কাজ করা বৈধ নয়, কারণ অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা যেমন: জান, মাল ইত্যাদি সংরক্ষণের তুলনায় দ্বীন সংরক্ষণ অগ্রাধিকার পায়। কেবলমাত্র আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ার কারণে যা অনুমোদন দিয়েছেন — যেমন: ইকরা মুলজি', সেটিই ব্যতিক্রম।

যদি দরুরাহর ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকের চেয়েও নিচু স্তরের হারাম কাজ — যেমন: লূত-عليه السلامএর কওমের কুকর্ম (সমকামিতা), কিংবা অজাচার (মাহরাম ব্যাক্তিরর সাথে ব্যভিচার) ইত্যাদি অনুমোদিত না হয়, তাহলে সবচেয়ে বড় গুনাহ — আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, এবং ত্বগুতদের কাছে বিচার চেয়ে তাদের ইবাদাত করা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

শায়খ আলী আল-খুদাইর:

দারুরাহ (চরম প্রয়োজন) শিরককে বৈধ করে না। শিরক কেবল তাদের জন্য বৈধ যাদেরকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করা হয় এবং তাদের হৃদয় ঈমানে অবিচল/দৃঢ় থাকে। তিনি বলেন:

“যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরি করল, কিন্তু সে ব্যাতিত –যে বাধ্য হলো আর তার হৃদয় ঈমানে অবিচল/দৃঢ়।“[সূরা নাহল ১০৬]

যদি সম্পদের ক্ষতি শিরককে বৈধ করতো, তাহলে সাহাবারা তাদের ধন-সম্পদ ও বাসস্থান ত্যাগ করতেন না এবং আল্লাহ'ﷻর জন্য হিজরত করে তাওহিদ ও ইব্রাহিমের মিল্লাহ অর্জন করতেন না।

আর এই বিষয়ে কিছু দলিল:

আল্লাহ ﷻবলেন: “ফিতনা হত্যা অপেক্ষা বড়।” [সূরা বাকারা ১৯১]

আল্লাহ ﷻবলেন: “ফিতনা হত্যার চেয়ে গুরুতর।” [সূরা বাকারা ২১৭]

ইবনে কাসীর رحمه الله তার তাফসীরে বলেন: “‘আবুল-‘আলিয়্যাহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ‘ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, দাহহাক এবং রাবি’ ইবনে আনাস বলেন: ‘শিরক হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।’”

শায়খ সুলাঈমান ইবনে সাহমান رحمه الله বলেন:

“যদি শহরবাসী এবং বেদুঈনরা যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তা এমন এক ত্বগুত প্রতিষ্ঠার চেয়ে কম ক্ষতিকর, যে(ত্বগুত) ভূমিতে ইসলামী শরীয়ার বিরোধী শাসন চালায়।“

দরুরহ (প্রয়োজনীয়তা) ও ইকরাহ (বলপ্রয়োগকে)-কে এক করে যারা তুলনা করে, তাদের জবাবে শায়খ হামাদ ইবনে ‘আতীক বলেন:

“আল্লাহ বলেন: ‘কিন্তু যে বাধ্য হয়েছে, আর সে কামনাকারী নয় ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার জন্য কোনো গোনাহ নেই।’ সুতরাং প্রয়োজনে তিনি শর্ত করেছেন যে, সে যেন কামনাকারী না হয় বা সীমা না লঙ্ঘন করে। এবং এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কোনোভাবেই গোপন নয়।”

আর তিনি বলেন:

তিনি (শায়খ ইবনে আতীক) আরও বলেন,

“প্রয়োজনে(দরুরতে) মৃত প্রাণী (মাইতা) ভক্ষণ করার অনুমতি কি স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ) করার প্রমাণ বহন করে?! এবং এটি কি এমন নয়, যেমন কেউ নিজের বোন বা কন্যাকে বিয়ে করে এই ক্বিয়াস করে যে, ব্যভিচার (যিনা) করে ফেলার আশঙ্কা ও ধনসম্পদের অভাবে একজন মুক্ত নারীকে বিয়ে করার পরিবর্তে দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি রয়েছে?!

যে ব্যক্তি দরুরত (প্রয়োজন) ও ইকরাহ (জবরদস্তি)–এর মধ্যে তুলনা করে, সে তো তাদের কিয়াসকেও ছাড়িয়ে গেছে, যারা বলেছিল, ‘ব্যবসা তো সুদের মতোই।’”

আল্লাহ ﷻবলেন:

“বলুন, আমার রব কেবলমাত্র অশ্লীলতা হারাম করেছেন – তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন – এবং গুনাহ, এবং অন্যায়ভাবে সীমা লঙ্ঘন, এবং আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরিক করাকে যার জন্য তিনি কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি, এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলা যার কোন জ্ঞান নেই।”[সূরা আরাফ : ৩৩]

আর তিনি বলেন:

“কিন্তু যে বাধ্য হয়েছে, আর সে কামনাকারী নয় ও সীমা অতিক্রমকারী নয়, তার কোনো গুনাহ নেই।”[সূরা বাকারা ১৭৩]

ইবনে তাইমিয়া তার ফাতাওয়ায় (১৪/৪৭৬) বলেন:

“শিরক, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কথা বলা, প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, এবং জুলুম – এসব বিষয়ে কোনো ধরনের মাসলাহা (কল্যাণ) নেই।” [যারা মাসলাহা’র(কল্যাণ, উম্মাহর কল্যাণ, দ্বীনের কল্যাণ) অজুহাতে শিরক বা ত্বগুতের কাছে বিচার পার্থনা অনুমোদন দেয় তাদের জন্য]

তিনি আরও বলেন:

“আল্লাহর দ্বীনে খালিস থাকা এবং ইনসাফ করা সব অবস্থায় এবং সব শরীআতের মধ্যে ফরজ।”

তিনি তার ফাতাওয়ায় (১৪/৪৭৭) বলেন:

“যে জিনিস প্রত্যেকের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম – এবং কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয় – তা হলো: অশ্লীলতা, জুলুম, শিরক এবং আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কথা বলা।”

তিনি বলেন (১৪/৪৭০-৪৭১):

"যেসব হারাম বিষয় পুরোপুরি স্পষ্ট, সেগুলো শরীআত কখনোই বৈধ করে না, না প্রয়োজনের সময়, না অপ্রয়োজনের সময় – যেমন: শিরক, অশ্লীলতা, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কথা বলা এবং জুলুম। এই চারটি বিষয় আল্লাহ ﷻ উল্লেখ করেছেন – বলুন, আমার রব কেবলমাত্র অশ্লীলতা হারাম করেছেন – তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন – এবং গুনাহ, এবং অন্যায়ভাবে সীমা লঙ্ঘন, এবং আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরিক করাকে যার জন্য তিনি কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি, এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলা যার কোন জ্ঞান নেই।– এগুলো সব শরীআতেই নিষিদ্ধ, এবং এই নিষেধাজ্ঞা নিয়েই সব নবীকে পাঠানো হয়েছে। এবং কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ এগুলোর অনুমতি দেননি। এজন্যই এটি একটি মাক্কী সূরায় নাযিল হয়েছে।"

তিনি তার ফাতাওয়ায় (১৪/৪৭৪) বলেন:

"একজন ব্যক্তি নিজে জানে যে একটি কাজ হারাম, তা জেনেও যদি সে মনে করে যে, এটি তাকে আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করবে, তবে সেটি করা বৈধ নয়।"

আর সীরাহ থেকে: মুসলমানরা তিন বছর শি'বে অবরুদ্ধ ছিলেন। আবার হাবশায় হিজরত এর ঘটনাও আছে। কুরাইশদের সাথে রাসূলﷺ-এর সাথে আলোচনার

ঘটনাও আছে। এই সমস্ত ঘটনাগুলোতে রাসূল ﷺকোনো কুফরি বা শিরক করেননি।

শায়খ নাসির আল-ফাহাদ:

শায়খ তার ফাতাওয়ায় মাসলাহা'র জন্য কুফর করা নাজায়েজ বলে দুইটি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথম প্রমাণ: এটি মাক্কী যুগ সম্পর্কিত।

মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের ওপর কাফিরদের পক্ষ থেকে নানান রকমের ফিতনা ও বিপদের ঘটনা। তাদের মধ্যে একটি দল নিহত হয়েছিল, আরেক দলকে নির্যাতন করা হয়েছিল, কাউকে বন্দী করা হয়েছিল, আবার অন্যরা (ঘর-বাড়ি থেকে) বিতাড়িত হয়েছিল—যেমন হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) হিজরত। পরিশেষে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গে থাকা লোকদের আবু তালিবের পাহাড়ি ঘাটিতে তিন বছর অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এমনকি তারা গাছের পাতা এবং এর অনুরূপ বস্তু খেতে বাধ্য হয়েছিল।

মক্কা শাসন করছিল আবু জাহাল ও তার সঙ্গীরা। তারা নবীﷺ-এর থেকে এটা চায়নি যে নবী ﷺতাদের মূর্তির ইবাদত করুক; বরং তারা শুধু চেয়েছিল, তিনি ﷺযেন

তাদের(মুশরিকদের উপাস্যদের) অপমান না করেন, তাদের প্রতি ও তাদের পূর্বপুরুষদের উপর তাকফির না করেন, এবং এর অনুরূপ।

যদি তারা (অর্থাৎ কুফফাররা) তাদের অবস্থানকে এমন কিছুর(অর্থাৎ তাদের মূর্তি ও পূর্বপুরুষদের উপর তাকফীর না করা) জন্য নিচু করতে চাইত , তাহলে তারা সবচেয়ে দ্রুত-মানুষ হিসেবে তা(তাদের অবস্থান) পরিত্যাগ করত এবং সাহাবীরা যা চায় তা দিত।

এমনকি সীরাহ’তে এটি বর্ণিত আছে যে তারা নবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী:

وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

“তারা চায় যে, তুমি যদি নমনীয় হও, তবে তারাও নমনীয় হবে,” [সূরা ক্বলাম, ৬৮:৯]

তবে সবচেয়ে বড় মাসলাহা (কল্যাণ) এবং শক্তভাবে ধরে রাখার বিষয় হলো তাওহীদে অবিচল থাকা এবং এমন সব কিছুর থেকে বারাআহ (বিচ্ছিন্নতা) ঘোষণা করা যা তাওহীদের পরিপন্থী। এটি হচ্ছে কুফর বিত ত্বগুত (ত্বগুতকে অস্বীকার/অবিশ্বাস)।

সুতরাং, যদি এই যুগের কিছু লোকের যুক্তিকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে দাওয়াতের মাসলাহার স্বার্থে নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা আবশ্যক হবে—এমনকি যদিও তারা তাওহীদ ধরে না রাখে এবং অনেক ঈমানভঙ্গকারী কাজ করে।

দ্বিতীয় প্রমাণ: এটি খাওয়ারিজদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস।

খাওয়ারিজদের নিন্দা করে অনেক মুতাওয়াতির হাদীস এসেছে, যেমন:

"তারা ইসলামের বাইরে চলে যাবে।"

"খাওয়ারিজ হচ্ছে আসমানের নিচে নিহতদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।"

"জাহান্নামের কুকুর।"

"যে তাদের হত্যা করবে, তার জন্য সুসংবাদ।"

এছাড়া, যখন তিনি তাদের বিশাল ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন:

তোমাদের মধ্যে একদল লোক আবির্ভূত হবে যাদের সালাত ও রোজা'র সামনে তোমাদের নিজেদের সালাত ও রোজা'কে তুচ্ছ মনে করবে।

তারা ছিল কিয়ামকারী(রাতের সালাত), সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতকারী। এটা তাদের জীবনী থেকে সুপরিচিত। তবুও সাহাবাহ সর্বসম্মতিক্রমে তাদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের নিন্দা করার বিষয়ে সম্মত হয়েছিল।

এটা ভালোভাবেই জানা যে, তারা যা করেছিল, তার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভালো—তারা সত্যের কামনা করছিল, ইসলাম ও তার প্রতীকসমূহকে সম্মান করত এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকত—এমনকি তারা বড় গুনাহকারীদের তাকফির করতো। তবুও, তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মানহাজ ছেড়ে ভিন্ন মানহাজ গ্রহণ করেছিল, তখন তাদের অনেক ইবাদত বা সৎ উদ্দেশ্যও তাদের জন্য উপকারে আসেনি। তারা সত্য চেয়েছিল, কিন্তু ভুল পথে চলেছিল।

তাহলে আজকের এই তথাকথিত ‘‘বিক্রি হয়ে যাওয়া’’ লোকদের অবস্থা কী হবে, যারা এমন এমন ঈমানভঙ্গকারী কাজ করেছে যা খাওয়ারিজরাও করেনি। তারা এমন একটি মানহাজ গ্রহণ করেছে যা নবীﷺ ও সাহাবাদের পদ্ধতির বিরোধী। বরং এমনকি খাওয়ারিজ, মু’তাজিলা, যায়িদিয়া, আশ’আরী ও অন্যান্য বিদআতিদের থেকেও বিরোধী—কারণ এদের কেউ-ই মাসলাহা’র স্বার্থে কুফরকে বৈধতা দেয় না।

[ফাতাওয়া আল-হাইরিয়্যাহ: ০১]

৩. শরীয়াহ আদালতের অনুপস্থিতির কারণে ত্বগুতের আদালত থেকে বিচার/রায়/ফায়সালা চাওয়াও শিরক।

শায়খ আবু বা'রা আস-সাইফ:

এটি অনুমোদিত নয় যে, শরীয়াহ্ আদালত অনুপস্থিত থাকার কারণে ত্বগুতের আদালতের কাছে বিচার চাওয়া যাবে।

কারণ আল্লাহ্ (আজ্যা ওয়া জাল্ল) ত্বগুতের নিকট বিচার চাওয়ার নিষিদ্ধতা এবং যে ব্যক্তি তা করে তার কুফর হওয়া শরীয়াহ্ আদালত বিদ্যমান থাকার শর্ত আরোপ করেননি বা এটিকে সীমাবদ্ধ করেননি।

অতএব, যদি শরীয়াহ্ আদালত না-ও থাকে, তবুও মানবরচিত আইন দ্বারা পরিচালিত আদালত থেকে বিচার চাওয়া নিষিদ্ধ।

ত্বগুতের নিকট বিচার চাওয়া যেহেতু কুফর ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তাই কোনো সময়, স্থান বা পরিস্থিতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে শিরক করা বৈধ নয়, ব্যতিক্রম শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি, যে ইকরাহ মুলজি (জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা)'র সম্মুখীন হয়, যার কোনো উপায়ান্তর নেই।

আর যারা বলে থাকেন যে, ত্বগুতের নিকট বিচার চাওয়ার বিষয়ে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো তখনকার পরিস্থিতিকে ঘিরেই ছিল— অর্থাৎ একদিকে ত্বগুতের দ্বারা বিচার ছিল, অন্যদিকে শরীয়াহ্ অনুযায়ী বিচার করার জন্য নবী ﷺ নিজে উপস্থিত ছিলেন — তাহলে এটি বলা যায় না যে, এই নিষেধাজ্ঞা কেবল সে সময়কার জন্য সীমাবদ্ধ।

ফিকহ ও উসূলের দৃষ্টিকোণ থেকে, কেবল নাযিলের প্রেক্ষাপট দ্বারা কোনো বিধান সীমাবদ্ধ করা হয় না।

কারণ, শিরক ও কুফরের নিষিদ্ধতা এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে শিরক করে (জবরদস্তি ছাড়া) তার কুফরের বিধান — এই বিষয়ক আয়াতসমূহ সার্বজনীনভাবে প্রতিটি সময় ও স্থানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

অবশ্য, যদি আমরা এই সীমাবদ্ধতার দাবিকে সাধারণীকরণ করে অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োগ করতে চাই, তাহলে তা কেবল বিভ্রান্তিই তৈরি করবে, যার ফাসাদ বা বিভ্রান্তি নিজেই এর মিথ্যা হওয়ার দলিল বহন করে।

যেমন, যদি কেউ বলে: জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে ফরয হওয়ার এবং তা পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ হওয়ার যেসব আয়াত এসেছে, তা তো এমন সময়ে এসেছে যখন মদীনায় দারুল ইসলাম ছিল এবং দারুল কুফরও ছিল, তাহলে এখন যেহেতু দারুল ইসলাম অনুপস্থিত, তাই প্রতিটি ব্যক্তির জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করা বৈধ

হবে — কেননা পরিস্থিতি তো তখনকার মতো নেই যখন এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল!

তাহলে এটি স্পষ্ট যে, এই যুক্তি বিকৃত এবং বাতিল — আর দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিতে এর ফিতনা ও বিভ্রান্তি বোঝা একান্ত জরুরি।

শায়খ আল-মুজাহিদ আবু আলী আল-আনবারী:

i. কুফর বিত ত্বগুত বা ত্বগুতকে অস্বীকার করা। কারণ কুফর বিত ত্বগুত ব্যাক্তিকে ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়া থেকে বিরত রাখে। সকল নবী-রাসুলের দাওয়াহ দুইটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেমন আল্লাহ ﷻবলেন, “আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং ত্বগুতকে বর্জন কর।“ কুফর বিত ত্বগুত তাশরীঈ’র পূর্বে আসে কারণ কুফর বিত ত্বগুত দ্বীনের অংশ, কোনো আদালত থাকুক আর না থাকুক।

ii. দ্বীন গ্রহণের জন্য এটা শর্ত যে অবশ্যই তাকে ত্বগুতকে অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহ ﷻবলেন, “অতএব, যে ত্বগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল

যা কখনো ভাঙ্গবে না।" তাই, যে ব্যাক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু ত্বগুতকে বর্জন করে না সে কালিমার শর্ত পূরণ করেনি, তাই সে মুসলিম না। ত্বগুকে অস্বীকার করা ঈমানের রুকুন, কোনো আদালত থাকুক আর না থাকুক।

iii. ইসলাম গ্রহণের পর ত্বগুতকে অস্বীকার করা ব্যাতিত কারো কোনো পথ নেই। তাই আল্লাহ ﷻবলেছেন, "এবং তাদেরকে একে(ত্বগুতকে) অস্বীকার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।" এই আদেশ কখন এসেছে? এটি এসেছে কারণ যে ব্যাক্তি বিচার অনুসন্ধান করছিল সে ইসলামের ভেতরেই ছিল। এজন্য যারা ইসলামের(ঈমানের) মধ্যে আছে তাদেরকে বলেছেন, "তোমরা ত্বগুকে অস্বীকার করতে আদিষ্ট। যদি তোমরা এই আদেশের বিপরীতে যাও এবং ত্বগুতের কাছে বিচার অনুসন্ধান করো তাহলে তোমাদের ঈমান নিছকই একটি দাবি মাত্র।"

৪. ত্বগুতদের কাছ থেকে তাহাকুম (বিচার ফয়সালা চাওয়া) জায়েজ নয়, যদিও তাদের বিধান শরীয়তের বিধানের অনুরূপ হয়।

শায়খ আবু বা'রা আস-সাইফ:

ত্বগুতের বিধান অনুযায়ী তাহাকুম বা বিচার চাওয়া হারাম, এমনকি যদি সেই বিধানগুলো ইসলামী শরিয়াহর অনুরূপ হয়—যেমন কিছু দেশে প্রচলিত পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আইন {(personal status laws) মানুষের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত আইনসমূহ—যেমন: বিয়ে, তালাক, মোহর, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার, অভিবাবকত্ব, ওয়ালী ইত্যাদি}। ত্বগুত যদি এ দাবিও করে যে এসব আইন ইসলামী শরিয়াহ থেকে নেওয়া হয়েছে বা সেগুলোর ভিত্তি শরিয়াহ—তবুও তা দ্বারা বিচার চাওয়া বৈধ নয়।

তাহাকুম/ত্বগুতের বিধানের মাধ্যমে বিচারপ্রার্থনা করা— যা শরয়ি বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ— বাস্তবে আল্লাহ ও তাঁর শরিয়তের পরিবর্তে ত্বগুতের কাছেই বিচারপ্রার্থনা করা। কারণ, আল্লাহ ﷻএই ধরনের বিচার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আল্লাহ ﷻবলেছেন:

"আমি এতটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে আমার কোনো শরিকের প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে কোনো আমল করে, আমি তাকে ও তার শিরককে পরিত্যাগ করি।" (মুসলিম)

ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে অন্য বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন:

"আমি তার সেই আমলকে তার সেই শরিকের দিকে ন্যস্ত করবো, যাকে সে আমার সাথে শরিক করেছে।"

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻনিজেকে এমন প্রতিটি আমল থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন, যাতে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে।

এমনই অবস্থা ত্বগুতের মানবসৃষ্ট আইনের, যা কুফফাররা তাদের আদালতে প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা সেখানে আল্লাহর বিধানের সাথে ত্বগুতের মানবরচিত আইনকে মিশ্রিত করেছে। আল্লাহ এই ধরনের আইন থেকে পবিত্র, এবং এগুলিকে তাঁর বিধান বলে দাবি করা যায় না। যে ব্যক্তি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বা এর কোনো অংশের মাধ্যমে বিচার চায়, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শরিয়তের বদলে ত্বগুতের কাছে বিচারপ্রার্থনা করেছে— এমনকি যদি তা শরিয়তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণও হয়।

এটি আল্লাহর এই বক্তব্যের কাছাকাছি, যেখানে তিনি প্রাচীন মুশরিকদের ফসল ও পশুর ব্যাপারে তাদের বিধান সম্পর্কে বলেন:

"আর তারা (মুশরিকরা) আল্লাহর সৃষ্টি করা ফসল ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে এবং বলে, 'এটা আল্লাহর জন্য'— তাদের দাবি অনুযায়ী; 'আর এটা আমাদের শরিকদের জন্য।' কিন্তু যা তাদের শরিকদের জন্য, তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; আর যা আল্লাহর জন্য, তা তাদের শরিকদের কাছে পৌঁছায়। তারা যা ফায়সালা করে তা কতই নিকৃষ্ট।"[সূরা আল-আন'আম: ১৩৬]

অতএব, আল্লাহ এমন সব বিধান থেকে পবিত্র ও বিচ্ছিন্ন, যেখানে তাঁর বিধানকে অন্যান্য বিধানের সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে। বরং আল্লাহ ঐ সমস্ত কিছুর থেকে মুক্ত, যাকে তাঁর সাথে শরিক করা হয়।

তাতারদের/মঙ্গোলদের 'আল-ইয়াসিক'-এর ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটেছিল (আল-ইয়াসিক ছিল চেঙ্গিস খান যে আইনটি তার বংশধরদের অনুসরণ করার জন্য লিখেছিলেন)। এটি তাদের বিচারপ্রার্থনার একটি পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছিল, এবং চেঙ্গিস খান আল-ইয়াসিকের কিছু বিধান ইসলামী শরিয়ত থেকে গ্রহণ করেছিল। তবুও, এর মাধ্যমে বিচারপ্রার্থনা করা— এমনকি একটি বিধানের ক্ষেত্রেও— ইজমা (ঐকমত্য) দ্বারা কুফর হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, যেমন ইবনে কাসির رحمه الله তাঁর "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া" খন্ড ১৩-এ উল্লেখ করেছেন।

তদুপরি, সে সময়ের আলিমরা আল-ইয়াসিক থেকে বিচারপ্রার্থনার ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান এবং অন্যান্য বিধানের মধ্যে কোনো

পার্থক্য করেননি। বরং তারা সবাই একমত হয়েছিলেন যে এটি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফর।

একই বিধান প্রযোজ্য বিকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিলের রহিতকৃত বিধানের ক্ষেত্রেও— যদিও সেগুলোতে কিছু বিধান আল্লাহর শরিয়তের সাথে মিলে যায় (যেমন তাওরাতে ব্যভিচারী বিবাহিত ব্যক্তিকে পাথর মেরে হত্যার বিধান)। তবুও, ইবনে হাযম, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখ আলিমগণ ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, এর (বিকৃত বিধান) কাছে ফয়সালা চাওয়া স্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফর। তারা আল্লাহর বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান থেকে বিচার চাওয়া এবং অন্যান্য বিকৃত বিধান থেকে বিচার চাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।

সুতরাং, শরিয়তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মানবরচিত আইনের মাধ্যমে বিচারপ্রার্থনা করা প্রকৃতপক্ষে ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়া এবং তা কুফরি।

শায়খ নাসির আল-ফাহাদ:

তিনি তার ফাতাওয়া আল-হাইরিয়্যাহ'র ১৬ এবং ১৭ নং ফাতাওয়ায় ভোটের মাধ্যমে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা/শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলেছেন। দুটি একই শ্রেণির ও বিধানের আওতাভুক্ত হওয়ায় তার কিছু অংশ উল্ল্যেখ করা হলো:'র ১৬ এবং ১৭ নং ফাতাওয়ায় ভোটের মাধ্যমে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা/শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলেছেন। দুটি একই শ্রেণির ও বিধানের আওতাভুক্ত হওয়ায় তার কিছু অংশ উল্ল্যেখ করা হলো:

❝ইসলামপন্থীরাও(তথাকথিত) যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, এবং সংবিধানকে ইসলামসম্মত করে ফেলে, তবুও সেটা আল্লাহ'ﷻর ফয়সালা/বিধান বলে বিবেচিত হবে না। বরং এটা হবে জনগণের ফায়সালা/জনগণের বিধান। কারণ এটা করা হয়েছে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী, আল্লাহ'ﷻর নির্দেশ অনুযায়ী নয়। যেকারণে সংসদ সদস্যদের পরিবর্তন হলে সাথে সাথে সেই বিধানও পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং এটি কখনোই শরীয়াহর শাসন হতে পারে না।❞

❝হ্যাঁ, {এটি (শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট দেওয়া) ইসলাম/ঈমানভঙ্গকারী বিষয়} এবং এটি হচ্ছে মানুষের শাসনব্যবস্থা, যাকে বলা হয় 'গণতন্ত্র'। আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে এর থেকে, এবং প্রতিটি ত্বগুতের থেকে বিমুক্তি ঘোষণা করি। এমনকি কেউ যদি বলে যে সকল মানুষ — কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় — শরিয়াহর পক্ষে ভোট দেবে, তবুও সেটি অবৈধ। এটি আল্লাহর শাসন নয়, বরং এটি মানুষের শাসন।

কারণ, আল্লাহ একে (শরীয়াহ আইন) ফরজ করেছেন বা প্রণয়ণ করেছেন বলে তারা শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন করেনি, বরং করেছে এই কারণে যে মানুষ তা চেয়েছে।❞

৫. ইকরাহ মুলজী/ইকরাহ'র ওজর বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ।

শায়খ আবু বা'রা আস-সাইফ:

ইকরাহ মুলজী বলতে বোঝানো হয়—একজন ব্যক্তিকে এমন জোর বা হুমকি দ্বারা কুফর করতে বাধ্য করা হয়, যা থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই। অধিকাংশ আলেমদের মতে, ইকরাহ মুলজী হলো এমন জোর বা চাপ যা প্রাণনাশ, অঙ্গহানি, বা অসহনীয় শারীরিক নির্যাতনের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম থাকে না।

ইমাম শাফি'ঈ رحمه الله কারাবাসকেও ইকরাহ মুলজী হিসেবে গণ্য করেছেন—সম্ভবত তিনি এমন দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস বোঝাতে চেয়েছেন, যা সহ্য করা যায় না বা এমন কারাবাস যেখান থেকে মুক্তি সম্ভব নয়, যতক্ষণ না কেউ কুফর করে অথবা মৃত্যু ঘটে। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন- "কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করলে এবং কুফরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার অন্তর ঈমানে অবিচলিত।"[সূরা আন-নাহল: ১০৬]

ইকরাহ মুলজী-কে জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো বাহ্যিকভাবে কুফর প্রকাশ করা, যখন অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে অটল থাকে।

উলামাগণ ইকরাহ'র শর্ত হিসেবে নিম্নোক্ত শর্তগুলোকে উল্লেখ করেছেন:

১. মুকরিহ-কে(যিনি হুমকি দিচ্ছেন) তার সেই হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকতে হবে—যেমন হত্যা, অঙ্গহানি বা এমন কঠিন নির্যাতন করা যা সহ্য করা যায় না, অথবা এমন দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস দেওয়ার শক্তি রাখতে হবে, তবেই ঐ ব্যক্তি মুকরাহ (ইকরাহ'র অন্তর্ভুক্ত) হবে।

২. মুকরাহ ব্যক্তি তার উপর থেকে ইকরাহ দূর করতে অক্ষম, এমনকি পালিয়ে গিয়ে হলেও(অর্থাৎ পালানোর মাধ্যমেও ইকরাহ দূর করতে অক্ষম বা পালাতে না পারা)। যদি সে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় যে তাকে ক্ষতি করার হুমকি দিচ্ছে, কিন্তু তারপরও না পালায়, তাহলে তাকে ইকরাহ্র অধীন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে না। আর এরপর যদি সে কুফরীতে লিপ্ত হয়, তবে সে একজন কাফির গণ্য হবে এবং তাকে ইকরাহর অজুহাত দেওয়া হবে না।

এরা তাদেরই মতো যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ﷻআমাদেরকে সূরা আন-নিসার এক আয়াতে অবহিত করেছেন—যারা মুশরিকদের কাতারে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয়েছিল, যদিও তারা এর আগে মক্কায় ইসলাম দাবি করেছিল। কিন্তু তারা হিজরত করেনি এবং মুশরিকদের মধ্য থেকে পালিয়ে যায়নি, অথচ তারা তা করতে সক্ষম ছিল। ফলে, যখন তাদের রাসূলুল্লাহ ﷺএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তখন এটি তাদের জন্য ইকরাহ্ হিসেবে গণ্য করা হয়নি, এবং তারা জাহান্নামে প্রবেশ করে।

আল্লাহ বলেন—

"যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশতাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম;' তারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে?' এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস।"[সূরা আন-নিসা: ৯৭]

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে-

"কিছু মুসলিম মুশরিকদের সঙ্গে ছিল এবং তারা রাসুলﷺ-এর বিরুদ্ধে থেকে মুশরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল। একটি তীর ছোড়া হয়েছিল যা একজনকে আঘাত করলো এবং তার মৃত্যু ঘটালো অথবা সে তরোয়ালের আঘাতে মারা

গেল।“ তখন আল্লাহ আয়াতটি—{যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময়...} নাযিল করলেন।

৩. মুকরিহ (যে হুমকি দিচ্ছে) তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন করবে দেরি করা ছাড়া। অর্থাৎ, যদি কেউ বলে—“এই এই কাজ (কুফর) করো, নতুবা আমি তোমাকে এক মাস পর হত্যা করব বা নির্যাতন করবো”—তবে তখন তাকে ইকরাহ অধীনে গণ্য করা হবে না, যতক্ষণ না সেই সময়সীমা এসে যায়।

৪. মুকরাহ ব্যক্তিকে ইকরাহ’র অধীনে যতটুকু বলা হয়েছে (কুফুরি কিছু করতে বা বলতে) তার চেয়ে বেশি যুক্ত করবে না। যদি সে তার চেয়ে বেশি কিছু যুক্ত করে (অর্থাৎ অতিরিক্ত কুফরি কাজ করে বা বলে) যা মুকরিহ (হুমকিদাতা) তার কাছ থেকে চায়নি তবে সে একজন কাফির।

অনুবাদক:

১. ইকরাহ’র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কুফরের প্রতি অন্তর খুলে দেওয়া যাবে না, অর্থাৎ যদি সে অন্তরে তাদের সাথে(বা কর্ম/কথার) সাথে একমত হয় তাহলে সে কাফির- যদিও সে মুকরাহ হয়।

২. শুধুমাত্র নিছক হুমকি ইকরাহ হতে পারে না, নির্যাতিত না হওয়া অবধি/কিছুটা শাস্তি বা নির্যাতন ভোগ না করা অবধি ইকরাহ'র অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটাই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলرحمه الله-এর মত, যখন তিনি

কারাগারে নির্যাতিত হচ্ছিলেন এবং আম্মারرضي الله عنه-এর ঘটনা উল্লেখ করেন।

"'আম্মার رضي الله عنه সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসবোধ করেননি, শুধুমাত্র সেই দিনটিতে যখন তার নির্যাতনকারীরা তাদের সমস্ত শয়তানি ও অবিচার নিয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। তারা আগুন দিয়ে তার চামড়া ঝলসে দিয়েছিল, তাকে মরুর উত্তপ্ত বালির উপর ফেলে দিয়েছিল উত্তপ্ত পাথরের নিচে চাপা দিয়েছিল, তাকে পানিতে ডুবিয়েছিল যতক্ষণ না তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল এবং তার ক্ষত ও ঘাঁগুলির চামড়া উঠে যাচ্ছিল। সেই দিন, যখন সে সেই ভয়াবহতার প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তারা তাকে বললো, "আমাদের দেবতার সম্পর্কে কিছু ভালো কথা বলো।" তারা একের পর এক কথা(কুফরি) বলতে থাকল, তারা যা বলছিল সে তা অজ্ঞান অবস্থায় পুনরাবৃত্তি করছিল।

যখন তাদের নির্যাতনের কারণে অজ্ঞান হওয়ার পর সে কিছুটা চেতনা ফিরে পেল, তখন সে যা বলেছিল তা মনে পড়ল এবং সে এতে রাগান্বিত হলো। এই ভুলটি তার কাছে এতটাই দৃঢ় হয়ে উঠল যে সে এটাকে একটি অক্ষমাযোগ্য পাপ হিসেবে দেখতে লাগলো, যার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যে তার অপরাধবোধ তাকে এতটাই কষ্ট দিল যে মুশরিকদের নির্যাতনও তার কাছে

মনে হতে লাগল এক রকমের আশীর্বাদ ও প্রশান্তি।’ এরপর আল্লাহ্ পরে মুকরাহ এর ক্ষমা সংক্রান্ত এই আয়াতগুলো নাযিল করেন।“[রিজাল হাওল আর-রাসুল, ১৬৬-১৬৭]

এছাড়াও, এটি আল খিরাক্বি, আল-কাদ্বি, আশ-শারিফ, আবু আল-খাত্তাব এবং আশ-শিরাযি প্রমুখের মত।

৬. ত্বগুতকে বিচারক না মেনে বিচার চাওয়াও জায়েয নয়।

অনুবাদক:

কেউ কেউ এমন দাবি করে থাকে যে, ত্বগুতকে বিচারক বা ফয়সালাকারী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে তার কাছে বিচার চাওয়াতে সমস্যা নেই অর্থাৎ শিরক হবে না। এমনটি শিরকেরর বাস্তবতা, ত্বগুত, কুফর বিত ত্বগুত, তাহাকুম নিয়ে চরম পর্যায়ের অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। এর কোনো ভিত্তি নেই, দালীল নেই, বরং এর বিপরীতটাই আছে। ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়া স্বতন্ত্রভাবে শিরক, এখানে ত্বগুতকে বিচারক মেনে নেওয়া বা না নেওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

মুকরাহ (বাধ্য ব্যক্তি) যখন ইকরাহর অন্তর্ভুক্ত হয় তখন ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়ার অন্যতম শর্ত থাকে তাকে অন্তর থেকে বিচার না মেনে নিয়ে বিচার চাওয়া। তাহলে কীভাবে ইকরাহর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও বিচার চাওয়া বৈধ হতে পারে শুধুমাত্র এই অজুহাতে যে “তাকে বিচারক মানি না?”

ত্বগুতের কাছে বিচার চাওয়া মূর্তিপূজার মতই, কারণ উভয়ই গ্বইরুল্লহর ‘ইবাদাত এবং তাওহীদের বিপরীত। এখন কেউ এটা বলতে পারবে না যে তার অমুক প্রয়োজনে/অমুক দুনিয়াবি লাভের উদ্দেশ্যে বা মাসলাহার জন্য সে মূর্তির

উপাসনা করেছে, এবং একে সে মা‘বূদ মনে করে না। আশ-শায়খ সুলাঈমান ইবনে সাহমান رحمه الله বলেছেন,

“এমনকি যদি আপনি গোটা দুনিয়াও হারিয়ে ফেলেন, তথাপি তা ফিরে পেতে ত্বগুতের কাছে ফয়সালা কামনা করা জায়িয নয়। আর যদি কেউ আপনাকে ত্বগুতের নিকট হুকুম (বিচার/ফয়সালা) কামনা এবং আপনার দুনিয়াবী জীবন ত্যাগ করার মধ্যে কোনটিকে বেছে নিতে বাধ্য করে, আপনার জন্য আবশ্যক হলো এটিকে (দুনিয়া) কুরবানী করা এবং ত্বগুতের নিকট হুকুম কামনা করা আপনার জন্য জায়িয নয়। ওয়াল্লহু আ‘লাম (আর আল্লাহই ভালো জানেন), আল্লাহ নাবী এবং তাঁর পরিবারের ওপর সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন” [আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ফীল আজওয়াবাতান নাজদিয়্যাহ, ১০/৫১১]। কোনও ইমামই তাহাকুমকে ইকরাহ ব্যতীত বৈধ বলেননি। বরং এই ধরণের দাবি ইরজার ‘আক্বীদাহর দিকেই ধাবিত করে।

৭. নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য/নিজেকে রক্ষা করার জন্য ত্বগুতের আদালতে গিয়ে সত্য/যুক্তি/প্রমাণ উপস্থাপন করা কুফর/শিরক নয়।

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা তাহাকুম নয়।

শায়খ আবু আলী আল-আনবারী:

তাহাকুম সংক্রান্ত মাসায়েল বুঝার জন্য অর্থাৎ, কোনটি তাহাকুম আর কোনটি তাহাকুম নয় তা বুঝার জন্য তাহাকুমের সংজ্ঞা বুঝতে হবে।

তাহাকুম অর্থ : বিচার চাওয়া, মামলা করা, দু'জনের মধ্যাকার বিবাদ মিমাংসার জন্য কাউকে বিচারক মানা।

আরবি ডিকশনারিসমূহে আছে:

تحاكم : تحكيم شخصين لطرف آخر

দুইজন লোক তৃতীয় পক্ষকে (কোন বিবাদ মিমাংসার জন্য) বিচারক বানানোকে তাহাকুম বলে।

আরবিতে বলা হয় :

تحاكم الطرفان إلى فلان : التجآ إليه ورفع الأمر إليه ليقضي بينهما القاضي

অর্থাৎ, দুই পক্ষ কাজির কাছে সমস্যাটি নিয়ে গেলো যেন সে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়।

আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী (تحاكم) তাহাকুম শব্দটি "বাবে তাফা-উল" থেকে এসেছে। আর এই বাবের বৈশিষ্ট্য হলো- দুই পক্ষ মিলে কোন কাজ করা বুঝানো। যেমন: (تقاتل) দুই পক্ষের যুদ্ধ, (تشاجر) দুই পক্ষের বিবাদ ইত্যাদি।

ত্বগুতের কাছে তাহাকুমের রুকন ৩ টি:

১. ত্বগুত বিচারক

২. বাদী পক্ষ

৩. বিবাদী পক্ষ

এই ৩টি পাওয়া গেলে এটি 'কুফরি তাহাকুম' হবে।

এই কুফরি তাহাকুমে :

বাদী পক্ষ অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে, কারণ সে ত্বগুতের কাছে তাহাকুম করেছে।

বিবাদী পক্ষ যদি ত্বগুতকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়, তবে সেও কাফির হয়ে যাবে।

বিবাদী পক্ষ যদি ত্বগুতকে বিচারক হিসেবে না মানে, শুধু নিজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডত করার জন্য আসে, তবে সে কাফির হবে না।

শায়খ আবু বা'রা আস-সাইফ:

ত্বগুতের আদালতে যাওয়া নিজেই/স্বয়ং একটি কুফরির কাজ নয়।

সুতরাং, ত্বগুতের আদালতে যাওয়ার সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে, এবং এর বিধান নির্ভর করে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার উপর।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাকে আদালতে হাজির হতে তলব করা হয়েছে, তার কাজ দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি হতে পারে:

১. হয়তো সে ত্বগুতের রায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছে, এবং সে তার রায় মেনে নেওয়ার ও আনুগত্য করার সংকল্প করেছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার এবং সে চায় যে ত্বগুতই তার বিষয়ে ফয়সালা করুক। আর সে বিশ্বাস করে যে এই ত্বগুতই মুসলিমদের অধিকার, তাদের রক্ত, সম্মান ও সম্পদের বিষয়ে ফয়সালা করার অধিকারী।

তাহলে এই ব্যক্তি কাফির, কারণ সে কুফরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, তা পালন করতে ইচ্ছুক এবং এই ফয়সালাকে পছন্দ করেছে। কেননা কুফরকে মেনে নেওয়া ও তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হলো কুফরে আকবর (বড় কুফর)।

২. অথবা সে নিজেকে ও তার অধিকার রক্ষার জন্য গিয়েছে, যাতে ত্বগুত তার বা তার সম্পদের উপর অন্যায় সিদ্ধান্ত না দেয়। অথবা সে ত্বগুতের ভয়ে গিয়েছে যে, যদি সে না যায় তবে তাকে অত্যাচার, ক্ষতি বা শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সে ত্বগুত, তাদের আইন ও বিধানকে অস্বীকার করে এবং তাদের ত্বগুত ও বিচারকদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে।

এই ক্ষেত্রে, তার উপস্থিতি "তাহাকুম" (ত্বগুতের কাছে বিচার/ফয়সালা চাওয়া) এর সংজ্ঞা ও অর্থের মধ্যে পড়ে না, যা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। কারণ সে ত্বগুতের ফয়সালা চায়নি, তাকে বিচারক বানায়নি, তার কাছে মামলা উত্থাপন করেনি—যা "তাহাকুম"-এর সংজ্ঞা। তাই তার এই কাজ শরয়ী বা ভাষাগতভাবে "তাহাকুম"-এর সংজ্ঞায় পড়ে না।

সুতরাং, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে যে আয়াত নাজিল করেছেন ত্বগুতের কাছে ফয়সালা চাওয়া সম্পর্কে—যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ত্বগুতের ফয়সালা কামনা করে—সেগুলো এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

যাদেরকে আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন—তারা ত্বগুতকে অস্বীকার করার যে কর্তব্য তাদের ওপর ছিল, তা পূর্ণ করেনি; যার মাধ্যমে তারা মুসলমান হতে পারত। বরং তারা ছিল সেইসব লোক, যারা ত্বগুতের শাসন কামনা করত, তাই তারা তার(ত্বগুতের) বিচার ও ফয়সালা চেয়েছিল এবং নিজেদের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত লাভের জন্য চেষ্টা করেছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা ত্বগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়?[সূরা আন-নিসা ৪:৬০]

ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বলেন:

“আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার করছেন যারা দাবি করে যে তারা আল্লাহর রাসূল ও পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান আনে, অথচ তারা বিবাদ মিমাংসায় আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছুর কাছে ফয়সালা চায়।“

সুতরাং, যে ব্যক্তি এই সূক্ষ্ম বিবরণ বুঝবে, তার কাছে অনেক বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বাদী (claimant) এবং বিবাদী (defendant)-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, বাদী ত্বগুতের কাছে মামলা উত্থাপন করে, তার ফয়সালা চায় এবং তাকে নিজের বিষয়ে বিচারক বানায়। এটি সরাসরি "তাহাকুম"-এর সংজ্ঞায় পড়ে, তাই সে এই কাজের মাধ্যমে কুফরিতে পতিত হয়।

অন্যদিকে বিবাদী, যাকে তলব করা হয়েছ বা ডাকা হয়েছে, সে শুধু নিজেকে ও তার অধিকার রক্ষার জন্য যায়, যাতে ত্বগুত তার উপর জুলুমকারী সিদ্ধান্ত না দেয়। অথবা সে আদালতের শুনানিতে উপস্থিত না হলে তাদের কর্তৃক জুলুম ও শাস্তির ভয় পায়। সে ত্বগুত, তাদের আইন, তাদের শিরক ও শরীয়াহ বহির্ভূত ফয়সালাকে অস্বীকার করে। সে ত্বগুতের ফয়সালা চায়নি, তাকে বিচারক বানায়নি, সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেনি। বরং সে গভীর ঘৃণা নিয়েই সেখানে গিয়েছে।

তবে, যদি পরে সে ত্বগুতের রায়ে সন্তুষ্ট হয়, তাদের ফয়সালাকে পছন্দ করে এবং তা মেনে নেওয়ার সংকল্প করে, তাহলে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে— কারণ সে কুফরকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিল এবং ত্বগুতের ফয়সালাকে অনুমোদন করল।

ত্বগুতের সামনে আত্মরক্ষা করা জায়েজ — যেমন প্রমাণ ও দলিল উপস্থাপন করে মুসলিম নিজেকে তাদের জুলুম ও কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে — তা হলো নবী ইউসুফ-عليه السلام এর ঘটনা, যা আল-আযীযের স্ত্রীর ঘটনার মধ্যে উল্লেখ আছে, যখন সে তাঁকে অনৈতিকভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল।

ত্বগুত আল-আযীয যখন এসে উপস্থিত হল, তখন তার স্ত্রী ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা ও অন্যায় অভিযোগ তোলে এবং তাঁকে কারাবাস বা শাস্তির মাধ্যমে দমন করতে চায়। এটি তার এই বক্তব্যে স্পষ্ট: 'যে তোমার পরিবারের সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে?' [সূরা ইউসুফ: ২৫]

তখন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এই ত্বগুতের সামনে নিজেকে ডিফেন্ড করে, যেন তার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপবাদ প্রমাণিত না হয় এবং ক্ষমতাবানরা তাঁর ওপর অন্যায়ভাবে শাস্তির বিধান না জারি করতে পারে। এটি তাঁর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট:'সে-ই আমাকে কু-প্ররোচনা দিয়েছে।'[সূরা ইউসুফ: ২৬]

আর আল্লাহ ﷻ তাঁর নবীদের সম্পর্কে বলেছেন, {এই নবীগণ আল্লাহ কর্তৃক সঠিক পথপ্রদর্শক ছিলেন, সুতরাং তাদের পথনির্দেশ অনুসরণ কর।}[আল-আনআম:৯০]

সুন্নাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি ত্বগুত নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবীকে একটি বিচার পরিষদে আহ্বান করেছিল, ঐ সময়ে যখন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল(অর্থাৎ কুরআন নাযিল হওয়া চলমান)। তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে এবং সেখানে তাদের নির্দোষিতা ঘোষণা করতে সেই সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তাদের এই কাজের বিরুদ্ধে কোনো কুরআনের আয়াত নাযিল হয়নি, যা তাদের কাজের বৈধতার প্রমাণ।

নাজাশী ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি ছিলেন একজন ত্বগুত এবং আবিসিনিয়ার শাসক। তিনি সাহাবীদেরকে—যাদের নেতৃত্বে ছিলেন জাফর বিন আবি তালিব—তার পরিষদে ডেকেছিলেন, আমর বিন আল-আস (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা/অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাই সাহাবীরা সেই পরিষদে গিয়েছিলেন।

ইমাম আহমাদرحمه الله-এর মুসনাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে , তিনি বলেন: ইয়াকুব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে শিহাব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম আল-মাখযুমির সূত্রে, যিনি উম্মু সালামা বিনতে আবি উমাইয়া ইবনে মুগীরা رضي الله عنها-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন:

"যখন আমরা আবিসিনিয়ার ভূমিতে পৌঁছলাম, আমরা সর্বোত্তম প্রতিবেশী নাজাশির সাথে বসবাস করতে থাকলাম। আমরা আমাদের ধর্ম নিরাপদে পালন করতে পারতাম, আল্লাহর ইবাদত করতাম এবং আমাদের কোনো কষ্ট দেওয়া হতো না, এমনকি আমরা কোনো অপছন্দনীয় কথাও শুনতাম না।

যখন কুরাইশরা এ খবর জানতে পারল, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা তাদের সবচেয়ে বিচক্ষণ দুই ব্যক্তিকে নাজাশির কাছে পাঠাবে এবং মক্কার পণ্যসামগ্রী থেকে তাকে উপহার দেবে। তাদের দেওয়া উপহারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল ঝোল বা সেদ্ধ পানিসমৃদ্ধ খাদ্য বা আঠালো মাংসের ঝোল, তাই তারা তার জন্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করল এবং তার কোনো পুরোহিতকেই তারা বাদ দিল না, বরং প্রত্যেককে তারা উপহার দিল।

তারপর তারা আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়া ও আমর ইবনে আল-আসকে পাঠাল এবং তাদেরকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলল: 'তোমরা নাজাশির সাথে কথা বলার আগে প্রত্যেক পুরোহিতকে উপহার দেবে। তারপর নাজাশিকে উপহার দেবে এবং এরপর তাদের সম্পর্কে কথা বলার আগেই তাকে বলবে যেন তিনি তাদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করেন।'

উম্মু সালামা رضي الله عنها বলেন: 'তারা নাজাশির কাছে গেল, আর আমরা তার সাথে নিরাপদে ও উত্তম প্রতিবেশিত্বে বসবাস করছিলাম। তারা কোনো পুরোহিতকেই বাদ দিল না, বরং নাজাশির সাথে কথা বলার আগেই প্রত্যেককে উপহার দিল। তারপর তারা নাজাশিকে উপহার দিল এবং তার পুরোহিতদের

প্রত্যেককে বলল: ‘আমাদের কিছু অজ্ঞ যুবক রাজার দেশে চলে গেছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম ত্যাগ করেছে, আর তোমাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি। বরং তারা একটি নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে, যা আমরা ও তোমরা কেউই চিনি না। তাদের সম্প্রদায়ের নেতারা আমাদেরকে রাজার কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে তাদের ফিরিয়ে আনা যায়। সুতরাং যখন আমরা রাজার সাথে তাদের বিষয়ে কথা বলব, তখন তাকে পরামর্শ দেবে যেন তিনি তাদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করেন এবং তাদের সাথে কথা না বলেন। কারণ, তাদের সম্প্রদায়ই তাদের অবস্থা ভালো জানে এবং তাদের ভুল সম্পর্কে বেশি অবগত।‘

পুরোহিতরা এতে রাজি হয়ে গেল। তারপর তারা নাজাশিকে উপহার দিল এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন। তারা তার সাথে কথা বলে বলল: ‘হে রাজা! আমাদের কিছু অজ্ঞ যুবক আপনার দেশে এসেছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম ত্যাগ করেছে, আর আপনার ধর্মেও প্রবেশ করেনি। বরং তারা এমন একটি নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে, যা আমরা ও আপনি কেউই চিনি না। আমরা তাদের সম্প্রদায়ের নেতাদের পক্ষ থেকে, তাদের পিতা, চাচা ও গোত্রের পক্ষ থেকে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছি, যাতে তাদের ফিরিয়ে আনা যায়। কারণ, তারা তাদের অবস্থা ভালো জানে এবং তাদের ভুল সম্পর্কে বেশি অবগত। তারা তাদেরকে তিরস্কারও করেছে।‘

উম্মু সালামা رضي الله عنها বলেন: 'আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়া ও আমর ইবনে আল-আসের জন্য এর চেয়ে বেশি অপছন্দনীয় আর কিছুই ছিল না যে, নাজাশি মুসলিমদের কথা শুনবেন।'

তিনি বলেন: 'তারপর নাজাশির চারপাশের পুরোহিতরা বলল: 'হে রাজা! তারা সত্য বলছে। তাদের সম্প্রদায়ই তাদের অবস্থা ভালো জানে এবং তাদের ভুল সম্পর্কে বেশি অবগত। সুতরাং তাদেরকে তাদের হাতে সমর্পণ করুন, যাতে তারা তাদের দেশ ও সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায়।'

উম্মু সালামা رضي الله عنها বলেন: 'নাজাশি রেগে গেলেন এবং বললেন: 'না, আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে তাদের হাতে সমর্পণ করব না। কোনো সম্প্রদায় আমার কাছে আশ্রয় চেয়ে এসেছে, আমার দেশে বসবাস করছে এবং আমাকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছে—এমনটা হয় না যে, আমি তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা না করেই তাদের সম্পর্কে এই দুই ব্যক্তি যা বলেছে, তা মেনে নেব। যদি তারা যেমন বলে, তাহলে আমি তাদেরকে সমর্পণ করব এবং তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে দেব। আর যদি তারা অন্যরকম হয়, তাহলে আমি তাদের থেকে তাদেরকে রক্ষা করব এবং যতদিন তারা আমার কাছে আশ্রয় চাইবে, আমি তাদের প্রতি সদয় থাকব।'

উম্মু সালামা رضي الله عنها বলেন: 'তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ডেকে পাঠালেন। যখন তার দূত তাদের কাছে এল, তারা একত্রিত হয়ে পরস্পর বলল: 'তোমরা যখন তার কাছে যাবে, তখন কী

বলবে?’ তারা উত্তর দিল: ‘আল্লাহর কসম! আমরা যা জানি এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যা নির্দেশ দিয়েছেন, তাই বলব। এতে যা নির্ধারিত আছে, তা ঘটবেই।‘

যখন তারা তার কাছে এল, নাজাশি তার বিশপদের ডাকলেন এবং তারা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো তার চারপাশে ছড়িয়ে দিল। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন: ‘এটা কোন ধর্ম, যার কারণে তোমরা নিজেদের সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়েছ, আর আমার ধর্মেও প্রবেশ করনি কিংবা অন্য কোনো জাতির ধর্মেও প্রবেশ করনি?’

উম্মু সালামা رضي الله عنها বলেন: ‘জাফর ইবনে আবি তালিব رضي الله عنه তার সাথে কথা বললেন এবং তাকে বললেন... (হাদীসের বাকি অংশ)।‘ [এই সনদ হাসান।]

অতএব, এই মাসআলার সমাপ্তি হলো—যার বিরুদ্ধে কোনো মামলা/অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং তাকে ত্বগুতের দ্বারা তলব/ডাকা হয়েছে, ফলে সে নিজেকে, তার অধিকার বা সম্পদ রক্ষার জন্য উপস্থিত হয়, যাতে ত্বগুত তার বিরুদ্ধে অন্যায় রায় না দেয়, অথবা সে ত্বগুতের শাস্তি/জরিমানার ভয়ে উপস্থিত হয়, কারণ সে দুর্বল ও অত্যাচারিত হবে যদি সে না যায়। আর এইসকল কিছু যখন সে ত্বগুত, তাদের আইন, তাদের শিরক, তাদের মিথ্যা এবং আল্লাহর শরীয়াহ ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা বিচার করার বিষয়ে অবিশ্বাসী হবে তখন জায়েজ হবে এবং তার উপস্থিতিতে কোনো গুনাহ থাকবে না, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে নবী ﷺ-এর সেই সাহাবীদের কর্ম থেকে যারা আবিসিনিয়ায় ছিলেন।

৮. ত্বগুতের হাতে বন্দি মুসলিমকে রক্ষার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা।

শায়খ আবু বা'রা আস-সাইফ:

ত্বগুতের হাতে বন্দি এক মুসলিমকে রক্ষার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করার মাসআলার কিছু বিস্তারিত রয়েছে এবং তা নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:

১. মামলার ধরন ও প্রকৃতি, এই মামলা মৃত্যুদণ্ড অথবা দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে গড়াবে কি না, সে বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

২. আইনজীবী নিজে কী করতে সক্ষম তার উপর নির্ভর করে। সে কি অভিযুক্ত/আসামিকে কুফর করার মাধ্যমে রক্ষা করবেন — যেমন, ত্বগুতের আদালতে মামলা দায়ের করে তার কাছ থেকে রায় চেয়ে (অর্থাৎ তাহাকুম করে)? অথবা তিনি কি আদালতের বৈঠকে কুফরি বক্তব্য পেশ করে তাকে রক্ষা

করাবেন, না কি সে শুধু শাস্তি কমাবে বা তা সম্পূর্ণ মওকুফ করিয়ে দেবে ঘুষ বা অর্থ প্রদানের মাধ্যমে?

এটি এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভিন্ন হয়। বরং কখনও কখনও একই দেশের এক আদালত থেকে অন্য আদালতেও ভিন্ন হয়।

সাধারণভাবে, যদি আইনজীবী নিয়োগে কোনো কুফরি কাজ না থাকে, বরং কেবলমাত্র বিচারককে টাকা প্রদান করে ত্বগুতের এই রায় এক মুসলিমের উপর থেকে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ এতে কোনো দোষ নেই।

তবে, যদি আইনজীবী নিয়োগে এমন কুফরি কাজ থাকে, যেমন:

নতুন মামলা দায়ের করা, বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা (তাহাকুম), এমন কুফরি বক্তব্য দেওয়া, যেখানে সে মানব-প্রণীত আইনসমূহকে সম্মান করে, ত্বগুত বিচারকদের সম্মান করে বা ত্বগুতের আইন ও বিধি অনুযায়ী আসামিকে রক্ষা করে, তাহলে তা অনুমোদিত নয়, যদি না এই মামলা মৃত্যুদণ্ড অথবা এমন দীর্ঘমেয়াদী শাস্তিতে পরিণত হয় যা একজন মানুষের সহ্যসীমার বাইরে, বা যদি বন্দিত্বকালে বন্দি অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হয়, এবং কেউ যদি তার পক্ষে

আইনজীবী নিয়োগ না করে, তাহলে সেই সাজা কার্যকর হয়ে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, ইমাম শাফি’ই-رحمه الله এর মত অনুযায়ী মানুষ ইকরাহ’র মধ্যে পড়ে যায় এবং তার আর কোনো উপায় থাকে না।

এই পরিস্থিতিতে, কে আইনজীবী নিয়োগ করল—বন্দি নিজে, না তার কোনো প্রতিনিধি বা পরিবার—তা কোনো পার্থক্য রাখে না। কারণ শরিয়াহ এমন অবস্থায় আইনজীবী নিয়োগকে বৈধতা দিয়েছে, এবং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত একটি বিষয়। ফলে যারা তার পক্ষে এমন একজন আইনজীবী নিয়োগ করেছে, তারা শরিয়াহসম্মত একটি কাজ করেছে এবং এতে তারা কোনো গোনাহগার হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

“আর সৎকাজ ও তাকওয়ার বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করো।”[সূরা আল-মায়িদাহ: ২]

অন্যথায়, ইকরাহ মুলজী ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কুফর করা বৈধ নয়।

الحمد لله رب العالمين،

والصلاة والسلام على رسوله الكريم